দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 APR 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কে হবেন?

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন

বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে চ্যান্সেলরের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে গত কলামে কথা বলেছিলাম। আসলে, গ্রহণযোগ্যতা কথাটি সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য এবং প্রয়োজনীয় ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষেত্রে। তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী এবং একাডেমিক প্রধান নন, বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের তিনি প্রথম ও প্রধান ব্যক্তি এবং সে সমাজের প্রতিনিধি, সরকারের নয়। বিশ্ববিদ্যালয় সত্তার একটা সৌন্দর্য রয়েছে, যা বিরল– অন্য কোথাও নেই, যা অতুলনীয়– পার্থিব কোন সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এই সৌন্দর্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সুউচ্চ, সুরম্য হর্ম্যরাজির স্থাপত্যকলায় নয়, সুবিন্যস্ত, সযত্নে রক্ষিত উদ্যানে নয়, ক্যাফেটেরিয়া, ক্যানটিন, স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল বা ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্রেও নয়। "The university is more than a physical structure, it is a spiritual being. বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটা অবয়বগত অস্তিত্ব নয়, এর আত্মিক অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেখানেই নিহিত প্রকৃত সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যসত্তা, আত্মিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে হবে, অনুভব করতে হবে শিক্ষক–শিক্ষার্থীর এবং গবেষণারত জ্ঞানার্থীর সৃজনশীল জ্ঞানানুশীলনের ভেতর, শিক্ষক–শিক্ষার্থী, গবেষক, প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মী– সকলের একাত্মবোধে, সংঘবদ্ধ চেতনায়। যিনি এই সৌন্দর্যসত্তাকে অম্লান রাখার, এই আত্মিক অস্তিত্বকে সব আঘাতের বিরুদ্ধে অক্ষত, অপরাজেয়, অপরাভূত রাখার এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের সদস্য হিসেবে সকলের ঐক্য চেতনার, গর্বানুভূতির প্রতীক হয়ে সবার মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন তিনিই হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। কিন্তু বাস্তবে এখন ভাইস চ্যান্সেলর পদের জন্য কে উপযুক্ত তা বিচার–বিবেচনা করা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ভিন্ন পরিমাপে। পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে গ্রহণযোগ্যতা,– এ সবকিছু ভুলে গিয়ে, এ পদের জন্য খোঁজা হয় "আমাদের লোক"। যিনি নিযুক্ত হন তিনি হয়তো অনেক গুণের অধিকারী, কিন্তু 'আমাদের লোক" হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে তিনি হয়ে উঠেন বিতর্কিত, সৃষ্টি হয় তার পক্ষ বিপক্ষের। প্রশ্ন উঠতে পারে– চ্যান্সেলর সিনেট নির্বাচিত প্যানেল থেকে ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ প্রদান করেন, এক্ষেত্রে "আমাদের লোক" নিযুক্ত করার সুযোগ কোথায়? পদ্ধতির অন্তরালে যে সুস্থ ধারণাটি থাকে তাকে উপেক্ষা করে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ যে অনেকভাবেই হতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী সিনেটে প্যানেল নির্বাচন যে কিভাবে প্রহসনে পরিণত হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনায় আমরা পরে আসছি। তার আগে একটি মৌলিক এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্নের অবতারণা করছি।

প্রশ্নটি হলো– বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদ অলংকৃত করার যোগ্যতা কি? না, সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রশাসনিক পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতার সূত্র বা সংজ্ঞা যেভাবে নির্ণীত হয়, আমার প্রশ্নটি ঠিক সে ধরনের বা সে লক্ষ্যে নয়। কারণ যা নিয়ে আমার প্রশ্ন তা পদ নয়, একটি 'মিশন', পদে নিযুক্তি বা আসীন হওয়া নয়, একটি 'মিশনে' নিয়োজিত হওয়া। আমার কথা শুনে কেউ হয়তো অবিশ্বাসের অস্বীকৃতির হাসি হাসবেন। কিন্তু অতীতে এই উপমহাদেশেরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাঁরা এই পদ গ্রহণ করতেন তারা একে একটা 'মিশন' হিসেবেই নিতেন, নিজেদেরকে একটা মহান ব্রতে ব্রতী বলে মনে করতেন। সুদূর অতীতে প্যারী, বোলোনা, অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানের পদকে অনুরূপ মর্যাদাই দেয়া হতো। কালের আবর্তে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের চিন্তায়, ধারণায়, বিশ্বাসে। অতীত হয়তো নিশ্চিহ্নপ্রায়, স্বীকার করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পঞ্চাশ দশক থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজজীবনে যেমন নতুন ধারা এসেছে, তেমনি এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজেও। কিন্তু অতীতের সবকিছুই কি একেবারে ধুয়েমুছে যাবে, কিছুই কি ধরে রাখা যাবে না? এ প্রশ্নের উত্তর আপাততঃ থাক। যে কথা বলছিলাম তাতে ফিরে আসি। বিশ্ববিদ্যালয় অতীতের মতো আর 'মনাস্টিক রিট্রিট' বা তপোবন নয়। কিন্তু বাইরের বৃহত্তর সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ না হলেও এ এক আলাদা জগৎ। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু কতিপয় অফিসের সমষ্টি নয়, নথি নাড়াচাড়া বা চলাচল নয়। বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষিত সচেতন সমাজ, যেখানে মেধা, বুদ্ধিমত্তা, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীলতা, মতের বিভিন্নতা, বিরোধিতা জীবনকে দেয় এক নতুন ব্যঞ্জনা, করে তোলে অস্থির এবং আন্দোলিত। আমার প্রশ্ন এই সমাজের যিনি প্রধান হবেন, কিংবা অতীত প্রভাবান্বিত হয়েই বলি, যিনি এই 'মিশনে' নেতৃত্ব দেবেন তার মধ্যে আমরা কি দেখতে আশা করি? কি কি বৈশিষ্ট্যের, গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে তার ব্যক্তিত্ব, চিন্তায় এবং কর্মে? আমাদের আশা, তিনটি বৈশিষ্ট্যে এবং গুণে সমৃদ্ধ থাকবে তার ব্যক্তিত্ব। একঃ তার পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞা এমন হবে যা তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করবে, তার নেতৃত্বকে করে তুলবে প্রশ্নাতীত। তার জ্ঞানানুরাগ অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে পরম নিষ্ঠায় জ্ঞানান্বেষণের পথে এগিয়ে যেতে। কারণ এ–ই হলো 'মিশন'– Transmission and creation of knowledge. শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বাইরের বৃহত্তর সমাজেও একজন জ্ঞানানুরাগী পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে তিনি সমাদৃত হবেন। দুইঃ উদারতা এবং সুদৃঢ় নৈতিকতার সমন্বয় ঘটবে তার ব্যক্তিত্বে। একদিকে উদারতা তাকে সাহায্য করবে সব ধরনের মতামতকে সহজভাবে দেখতে, সংবেদনশীল মন নিয়ে তা বিশ্লেষণ করতে। অবশ্য তিনি গ্রহণ করবেন সেই মতই যা যুক্তিপূর্ণ, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সত্যিকার অর্থে মঙ্গলজনক। অন্যদিকে সুদৃঢ় নৈতিকতাবোধ তাকে করে তুলবে নিরপেক্ষ এবং ন্যায়ানুগ, যা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। তার নীতি এবং নীতি প্রয়োগ বা কাজের ধরন হতে হবে সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছ, সব সংশয়, সন্দেহ এবং পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে। তিনি এমন মানসিকতার অধিকারী হবেন যা তাকে উদ্বুদ্ধ করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমষ্টিগত কল্যাণে, স্বার্থরক্ষায়, কিন্তু কোন গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষায় নয়। তিন ঃ সবচেয়ে বড় কথা, সমাজে এবং দেশে তিনি হবেন একজন অবিতর্কিত ব্যক্তি। এ কথার অর্থ এই নয় যে, সারাদেশ এবং সমাজ তার সমর্থনে এবং সুখ্যাতিতে সোচ্চার হয়ে উঠবে। তিনি এমন কিছুর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেননি যার ফলে তাকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল বা ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তাকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। এর অর্থ এও নয় যে, দেশের আর্থ–সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে তার কোন মতামত থাকবে না। অবশ্যই থাকবে, কিন্তু মতামত আসবে জ্ঞানসাধকসুলভ দূরত্ব থেকে, একটা নিরপেক্ষ এবং নিঃস্বার্থ অবস্থান থেকে। সব ধরনের দলীয় বা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকবে তার ব্যক্তিত্ব। যারা ভাইস চ্যান্সেলর প্যানেল নির্বাচন করবেন বা যিনি নিয়োগ প্রদান করবেন তাদের বিবেচনায় এই বিষয়টি অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কারণ বিতর্কিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য হবেন না এবং এই গ্রহণযোগ্যতাই ভাইস চ্যান্সেলর পদ পূরণের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি ভিন্ন অবস্থা। গ্রহণযোগ্যতা নয়, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, দল বা দলীয় সরকারের প্রতি আনুগত্যই বিবেচনায় বড় হয়ে দেখা দেয়। অনুগত বা 'নিজের লোক'কে এই পদে নিযুক্তি দেবার প্রয়াসে সিনেট কর্তৃক প্যানেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার চলে এবং এর ফলে নির্বাচন পদ্ধতিই প্রহসনে পরিণত হয়।

> ভাইস চ্যান্সেলর পদের জন্য কে উপযুক্ত তা বিচার–বিবেচনা করা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ভিন্ন পরিমাপে। পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে গ্রহণযোগ্যতা,– এ সবকিছু ভুলে গিয়ে, এ পদের জন্য খোঁজা হয় "আমাদের লোক"। যিনি নিযুক্ত হন তিনি হয়তো অনেক গুণের অধিকারী, কিন্তু 'আমাদের লোক" হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে তিনি হয়ে উঠেন বিতর্কিত, সৃষ্টি হয় তার পক্ষ বিপক্ষের।

কিভাবে তা হয় তার একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ১৯৭৩–এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং জাহাঙ্গীরনগর– এদেশের এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্তৃপক্ষ হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। এই সিনেটের একটি প্রধান দায়িত্ব হলো ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিযুক্তির জন্য তিনজনের একটি প্যানেল তৈরি করা। আদেশে যদিও মনোনয়ন লেখা আছে, আসলে নির্বাচনের মাধ্যমেই এই প্যানেল তৈরি হয়। পদাধিকার বলে ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো–ভাইস চ্যান্সেলর ও কোষাধ্যক্ষ, ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি, ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি, ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধিসহ সিনেটে রয়েছেন সরকার মনোনীত সরকারী কর্মচারী, জাতীয় সংসদের মনোনীত সদস্য, চ্যান্সেলর মনোনীত শিক্ষাবিদ, সিন্ডিকেট মনোনীত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, একাডেমিক পরিষদ মনোনীত অধিভুক্ত ও প্রতিনিধিত্বকারী কলেজসমূহের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ এবং পদাধিকার বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কলেজ অধ্যক্ষ ও শিক্ষক সদস্য নেই। অন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কলেজ অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক সদস্যরা প্রধানতঃ সরকারী কলেজের। সুতরাং দেখা যায়, ৩৫ জন মনোনীত এবং একজন পদাধিকার বলে সদস্য ক্ষমতাসীন সরকারের প্রভাবাধীন। ভাইস চ্যান্সেলর প্যানেলে নির্বাচিত হবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিনেটের এই সরকার প্রভাবান্বিত অংশটি স্বাভাবিকভাবেই determining factor বা জয়পরাজয় নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায় এবং এদের সমর্থনের মাধ্যমেই 'অনুগত'কে প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। আশির দশকের মাঝামাঝি এরশাদ আমল থেকে এ ধরনের প্রভাব বিস্তার প্রকটভাবে শুরু হয়। প্রভাব বিস্তারের কথা আমি জানতে পারি সে আমলের জাতীয় সংসদের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনেট সদস্যের কাছ থেকে। তাকে সে আমলের একজন শিক্ষামন্ত্রী সতর্ক করে দিয়েছিলেন 'অনুগত'–এর নামটি ভাল করে দেখে নিয়ে ভোট দিতে– "মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান নয়, মনিরুজ্জামান মিঞা"।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হবে না– এই আশ্বাস পাওয়া গেছে সরকারের পক্ষ থেকে। তবুও আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছি কি? তাই আমরা মনে করি ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার। প্রহসন আর নয়। কিন্তু নির্বাচন পদ্ধতি বর্জন করে নয় বরং এর পরিধি বৃদ্ধি করে। যথা, প্যানেল নির্বাচনের দায়িত্ব শুধু সিনেটের কাছে ছেড়ে না দিয়ে, সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক পরিষদ– এই তিনের যৌথ সভায় প্যানেল তৈরি হতে পারে। এর পেছনে যুক্তি তিনটি। একঃ এই তিনটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত। দুইঃ ভাইস চ্যান্সেলর এই তিনটিরই চেয়ারম্যান। তিনঃ এতে বাইরের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ অনেকাংশে হ্রাস পাবে।